বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

উপস্থিত ঃ

বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফ

এবং

বিচারপতি জনাব বিশ্বজিৎ দেবনাথ

মৃত্যুদন্ড রেফারেন্স নং ৬২/২০১৭

রাষ্ট্র

বনাম

আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু

......নির্জন প্রকোষ্ঠের কয়েদী

সঙ্গে-

ফৌজদারী আপীল নং ৫৬৫৬/ ২০১৭

আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু

........আপীলকারী

বনাম

রাষ্ট্র

........প্রতিবাদী পক্ষ

সঙ্গে-

জেল আপীল নং ২১০/ ২০১৭

আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু

.......আপীলকারী

বনাম

রাষ্ট্র

........প্রতিবাদী পক্ষ

জনাব হারুনুর রশীদ, ডি. এ. জি. সঙ্গে
জনাব জাহিদ আহমেদ (হিরো), এ. এ. জি সঙ্গে
জনাব মোহাম্মদ সাফায়েত জামিল, এ. এ. জি সঙ্গে
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, এ. এ. জি

......রাষ্ট্রপক্ষে

জনাব সরওয়ার আহমেদ, এ্যাডভোকেট
জনাব সুধেন্দু কুমার বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট
জনাব আঃ রাজ্জাক, এ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব আলো মন্ডল, এ্যাডভোকেট সঙ্গে

জনাবা শামীমা ইসলাম, এ্যাডভোকেট
........আপীলকারীর পক্ষে

শুনানীঃ ২৯-০১-২০২৩ খ্রিঃ এবং ০৫-০২-২০২৩ খ্রিঃ
রায় প্রদানের তারিখঃ ০৬-০২-২০২৩ খ্রিঃ

বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফঃ

[ভাষা সৈনিক এবং ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অত্র রায়টি বাংলায় প্রদান করা হলো।]

১. ভূমিকাঃ

এই মৃত্যুদন্ড রেফারেন্সটি (Death Reference No. 62 of 2017) অত্র আদালতের কাছে তথা হাইকোর্ট বিভাগের কাছে পাঠানো হয়েছে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩৭৪ ধারা অনুযায়ী। এটি পাঠিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল যশোরের বিজ্ঞ বিচারক। উক্ত বিচারক তাঁর নিকট বিচারাধীন ২০১৩ ইং সালের নারী ও শিশু মামলা নং- ৬০ [ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ১১(ক)] তে আসামী আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতুকে ১৭/০৫/২০১৭ ইং তারিখের আদেশ ও রায়মূলে মৃত্যুদন্ড প্রদানপূর্বক তা অনুমোদনের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির উপরোল্লিখিত ধারায় অত্র আদালতের নিকট প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে উক্ত দন্ডপ্রাপ্ত আসামী নিয়মিত ফৌজদারী আপীল, তথা ২০১৭ ইং সালের ফৌজদারী আপীল নং- ৫৬৫৬ এবং ২০১৭ ইং সালের জেল আপীল নং-২১০, দায়ের করায় উক্ত আপীলসমূহ ও এই মৃত্যুদন্ড রেফারেন্সের সাথে শুনানীর জন্য একত্রে হাইকোর্ট বিভাগের অত্র বেঞ্চের নিকট প্রেরণ করা হয় । ফলে বিষয়গুলি অত্র রায়ের মাধ্যমে একসঙ্গে নিষ্পন্ন করা হবে।

২.প্রেক্ষাপটঃ

২.১ প্রসিকিউশন কেস সংক্ষেপে এই যে, পি. ডাব্লিউ. ১ (এজাহারকারী) ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখে যশোর জেলার অধীন কোতয়ালী মডেল থানায় এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, তিনি তার কন্যা সালমা খাতুন (২২) কে ১$\frac{১}{২}$ (দেড়) বছর পূর্বে ০১ নং আসামী আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু এর সাথে মুসলিম শরীয়ত মোতাবেক ১ লক্ষ টাকা দেনমোহরে বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের পরে আব্দুল্লাহ এবং তার পরিবারের সদস্যরা একটি পালসার মোটর সাইকেল যৌতুক হিসাবে দাবী করতে থাকে এবং তার কন্যাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতে থাকে । এজাহারকারী (পি. ডাব্লিউ-১) রাজমিস্ত্রির কাজ করে বিধায় তার পক্ষে মোটর সাইকেল যৌতুক হিসাবে দেয়া সম্ভব নয় জানালে আসামীগণ তার কন্যাকে তালাক দিবে মর্মে হুমকি দেয় এবং বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তীতে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় আসামীগণ তার কন্যাকে আসামীদের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তার কন্যা গর্ভবতী হয়। ইতোমধ্যে আসামীগণ আবারো তার কন্যাকে উক্ত মটর সাইকেলের দাবীতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। গত ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত অনুমান ০৩.০০ ঘটিকার সময় এজাহারকারী (পি.ডাব্লিউ-১) আসামীদের প্রতিবেশীর নিকট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানতে পারেন যে তার কন্যা অসুস্থ। তিনি তখন ভোর বেলায় আসামীর বাড়িতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তার পোড়া ঝলসানো মৃত কন্যা চিৎ অবস্থায় খাটের উপর পড়ে আছে। এজাহারকারী তখন ১নং আসামীর (মেয়ে জামাই) সন্ধান করে পাননি এবং তার পিতা ২ নং আসামীকেও পাননি, কারন তারা পালিয়ে যান। পরবর্তীতে পুলিশ আসে, সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং

কন্যার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আসামী আব্দুল্লাহ, অন্যদের যোগসাজসে ও কুপরামর্শে, বিগত ০৮/০৭/২০১২ ইং দিবাগত রাত অর্থাৎ ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত্র ২.০০ টা হইতে ৩.০০ টার মধ্যে যে কোনো সময় যৌতুক হিসাবে উক্ত মোটর সাইকেলের দাবীতে তার কন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ করে কেরোসিন জাতীয় পদার্থ গায়ে ঢেলে আগুনে পুড়ে দেয়।

২.২ উক্ত এজাহার দায়েরের প্রেক্ষিতে তা ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ("উক্ত আইনের") ১১(ক)/৩০ ধারায় কোতয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৩৯ তারিখ-০৯/০৭/২০১২ হিসাবে রুজু হয়। ইতোমধ্যে একটি জিডিমূলে পি.ডাব্লিউ-৮ (তদন্তকারী কর্মকর্তা) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং মৃতদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি এই মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে এজাহারনামীয় আসামীদের গ্রেফতার করেন, আলামত সংগ্রহ করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। ঘটনাস্থলের ম্যাপ ও সূচী তৈরি করেন এবং ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণপূর্বক আসামী আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু এবং তার পিতার বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ১১(ক)/৩০ ধারায় অভিযোগপত্র নং- ১০৮৬ তারিখ ০৫/১১/২০১২ দাখিল করেন। পরবর্তীতে মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ায় তা যশোর জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হয় এবং তা ২০১৩ ইং সালের নারী ও শিশু মামলা নং- ৬০ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। ট্রাইব্যুনাল আসামী আব্দুল্লাহর পিতা মোঃ আইয়ুব আলীর জামিন মঞ্জুর করতঃ পরবর্তীতে ০৮/১০/২০১৩ ইং তারিখের আদেশমূলে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫(সি) ধারায় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেন। পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনাল ২২/০৬/২০১৪ ইং তারিখের

আদেশমূলে আসামী আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ১১(ক) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। তবে অভিযোগ পাঠ করে শুনালে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবীপূর্বক বিচার প্রার্থনা করেন।

২.৩ বিচার চলাকালীন প্রসিকিউশন পক্ষ (রাষ্ট্রপক্ষ) ১১ জন সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-১-পি.ডাব্লিউ-১১) উপস্থাপন করেন অন্যদিকে আসামীপক্ষ কোনো সাক্ষী প্রদান করেননি। সাক্ষীদের সাক্ষ্য রেকর্ডপূর্বক ট্রাইব্যুনাল আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করলে আসামী পুনরায় নিজেকে নির্দোষ দাবী করে কোনো সাফাই সাক্ষী বা বক্তব্য দিবে না মর্মে জানায়। পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের শুনানী শ্রবণপূর্বক বিগত ১৭/০৫/২০১৭ ইং তারিখের তর্কিত রায় এবং আদেশের মাধ্যমে আসামী আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতুকে উক্ত আইনের ১১(ক) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড ও নগদ ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। অতঃপর, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৭৪ ধারা মোতাবেক মৃত্যুদন্ড অনুমোদনের জন্য ট্রাইব্যুনাল উক্ত মামলার সমস্ত নথি, কাগজপত্র ইত্যাদি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করেন। ফলশ্রুতিতে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নপূর্বক বিষয়টি ২০১৭ ইং সালের মৃত্যুদন্ড রেফারেন্স মামলা নং-৬২ হিসাবে নিবন্ধিত হয়।

৩.<u>সাক্ষীগণের সাক্ষ্যঃ</u>

আগেই বলা হয়েছে, আসামী ইতোমধ্যে নিয়মিত আপীল ও জেল আপীল করায় উক্ত আপীলসমূহ অত্র মৃত্যুদন্ড রেফারেন্সের সাথে শুনানী এবং নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগের অত্র বেঞ্চে প্রেরণ করা হয়। শুনানীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রপক্ষ তথা বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব হারুনুর রশীদ অত্র ডেথ রেফারেন্সের পেপারবুক, নিম্ন আদালতের নথিপত্র এবং প্রদর্শনীসমূহ একের পর এক উপস্থাপন করেন এবং

মৃত্যুদন্ড অনুমোদনের পক্ষে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সরওয়ার আহমেদ আসামীর নিয়মিত আপীলের সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করেন এবং আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্তপূর্বক খালাস দেয়ার প্রার্থনা করেন। তবে পক্ষগণের বক্তব্য নিয়ে আলোচনার পূর্বে দেখা যাক সাক্ষীগণ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে কি কি সাক্ষ্য প্রদান করেছেনঃ-

রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-১) মোঃ কবির হোসেন- এই মামলার ভিকটিমের পিতা এবং এজাহারকারী। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন- ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ৩.০০ ঘটিকার সময় মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ঘটনা ঘটে এবং তিনি মেয়ে জামাইর প্রতিবেশীর নিকট ফোনে জানতে পারেন যে, তার মেয়ে গুরুতর অসুস্থ। তিনি তখন ভোর বেলায় তার ছোট ভাই ফারুক, প্রতিবেশী ইউনুচ আলী (পি.ডাব্লিউ-২) এবং তার ছোট মামা হায়দার আলী (পি.ডাব্লিউ-৬) কে নিয়া কন্যার শ্বশুর বাড়ি যান এবং আসামী আব্দুল্লাহর কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন যে, তার কন্যা সালমা আগুনে পুড়ে ঝলছে গেছে এবং দাঁত বের হওয়া অবস্থায় মৃত পড়ে আছে। তিনি আরো বলেন যে, তার মেয়ে জামাই তার এবং তার মেয়ের কাছে একটি পালসার মোটর সাইকেল যৌতুক হিসাবে দাবী করেছিল। ওই মোটর সাইকেল না পেয়ে আসামী আব্দুল্লাহ তার কন্যাকে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করে এবং তখন তার কন্যা ৬(ছয়) মাসের গর্ভবতী ছিল। তিনি আরো বলেন, তিনি ঘটনাস্থলে পোঁছাবার ৫(পাঁচ) মিনিট পর পুলিশ আসে এবং সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে একটি সবুজ রংয়ের কেরোসিনের বোতল, একটি জায়নামাজের পোড়া অংশ, একটি পুরাতন কম্বলের পোড়া অংশ জব্দতালিকামূলে জব্দ করেন- যা এই সাক্ষী স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষী তখন উক্ত জব্দতালিকা এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রমান করেন যা **প্রদর্শনী-১** এবং **প্রদর্শনী-১/১** হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। পুলিশ তখন লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং তাতে এই সাক্ষীর স্বাক্ষর নেয়। এই

সাক্ষী তখন সেই সুরতহাল রিপোর্ট এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রমান করেন, যা **প্রদর্শনী-২** এবং **২/১** হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সাক্ষী থানায় গিয়ে এজাহার দাখিল করেন, যা তিনি **প্রদর্শনী-৩** এবং এজাহারে তার স্বাক্ষর **প্রদর্শনী-৩/১** হিসাবে প্রমান করেন। এই সাক্ষী ডকে থাকা আসামী আব্দুল্লাহকে সনাক্ত করেন।

আসামী পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বিবাহের সময় আসামী হামিদপুর দাখিল মাদ্রাসায় পড়তো না, তবে তাকে দোকানে থাকতে দেখেছেন। তিনি আরো বলেন যে, এজাহারটি তিনি লিখেননি, কেউ একজন লিখে দিয়েছেন। থানার লোকজন লিখে দেন এবং তিনি তা স্বাক্ষর করেন। তিনি আরো জানান তিনি লেখাপড়া বোঝেন না বিধায় এজাহারটি পড়তে পারবেন না। জেরায় তিনি আরো বলেন যে, রাত আড়াইটা/তিনটার দিকে মোবাইল কলটি আসে, তবে এজাহারে তিনি সেই মোবাইল নাম্বার বা তার নিজের মোবাইল নাম্বার দেননি এবং কে মোবাইল ফোন করেছিল তা এজাহারে উল্লেখ করেননি। তিনি আরো বলেন যে, তার কন্যা ঘটনার পূর্বেই বাপের বাড়ি চলে আসে তা সত্য নয়, তবে মেয়ে জামাইর সাথে গোলমাল হলে মেয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আসামী ও আসামীর পিতা বাড়িতে গেলে কন্যাকে তাদের কাছে দেয়। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, মেয়ে জামাই যে পালসার মোটর সাইকেল যৌতুক দাবী করেছে তা তিনি কোনো মেম্বার, চেয়ারম্যানকে বা থানায় জানাননি। তিনি আরো জানান যে, ঘটনার বাড়িতে ভোর ৬.০০ ঘটিকায় গিয়ে জামাইকে তিনি দেখেননি। আসামী পক্ষের জেরায় তিনি আরো বলেন যে, কথিত ঘটনার সময় আসামী যশোর আলিয়া মাদ্রাসায় ছিল, তা সত্য নয়। তিনি আরো জানান যে, ঘটনার রাত্রে আসামী তার মামার বাড়ি যশোরে ছিল, তা সত্য নয়। আসামী পক্ষের দেয়া ইঙ্গিতমূলক প্রশ্ন তথা তার কন্যা নিজেই মৃত্যুকে আহ্বান করেছেন মর্মে করা প্রশ্ন তিনি তা সরাসরি অস্বীকার করেন এবং তিনি এও অস্বীকার করেন যে, আসামী ঘটনার সাথে

জড়িত নয়। পরবর্তীতে উক্ত সাক্ষীকে রি-কলপূর্বক পুনরায় জেরা করা হয় তাতে তিনি জব্দকৃত আলামত তথা- সবুজ বোতলের পোড়া অংশ- যা ছিপি বিহীন, যাতে কেরোসিন জাতীয় গন্ধ পাওয়া যায়, তা বস্তু প্রদর্শনী-I, জায়নামাজের পোড়া অংশ, বস্তু প্রদর্শনী-II এবং সেই পুরাতন কম্বলের পোড়া অংশ, বস্তু প্রদর্শনী-III হিসাবে প্রমান করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-২) মোঃ ইউনুচ আলী- এজাহারকারীর প্রতিবেশী। তিনি তা সাক্ষ্য প্রদানকালে নিশ্চিত করেন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি নিহত সালমা খাতুনকে চিনতেন এবং আরো বলেন যে, ঘটনা ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত্র ০২.০০ ঘটিকা হইতে ০৩.০০ ঘটিকার মধ্যে এবং ওই সময়ে আসামী ভিকটিমের কাছ থেকে যৌতুক হিসাবে পালসার মোটর সাইকেল দাবী করে না পেয়ে তাকে পুড়িয়ে হত্যা করে। তিনি আসামীকে ডকে সনাক্ত করেন। আসামী পক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, আসামী ও ভিকটিমের বিবাহের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আরো বলেন যে, বিবাহের সময় ভিকটিম ৮ম শ্রেণিতে পড়তো এবং আসামী ওই সময়ে ছাত্র ছিল কিনা তিনি জানেন না। তিনি আরো বলেন যে, ঘটনার পর এজাহারকারীর বাড়িতে গিয়ে যেই ঘটনা শুনেন ও দেখেন তা উনি দারোগাকে বলেন নাই তা ঠিক। ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ কি মাস এবং কি বার, তা তিনি বলতে পারেন না। তিনি আরো বলেন যে, আসামী কবে কয় তারিখ যৌতুক হিসাবে পালসার মোটর সাইকেল দাবী করেন, তা তিনি বলতে পারবেন না। ভিকটিম নিজে আত্মহত্যা করেছেন মর্মে আসামী পক্ষে দেয়া ইঙ্গিতমূলক প্রশ্ন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, ভিকটিমের পেটে ব্যথার অসুখ ছিল কিনা তা তিনি জানেন না।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-৩) মোঃ ফজলুর রহমান বাবু- ঘটনাস্থল গ্রামের নিবাসী তথা সুলতানপুর নিবাসী এবং তিনি উক্ত এলাকার প্রাক্তন

মেম্বার। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ জব্দতালিকা প্রস্তুত করে তার সাক্ষ্য নেন। তিনি সেমতে জব্দতালিকা (প্রদর্শনী-১) এবং তাতে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-১/২) প্রমান করেন। আসামী পক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, জব্দকৃত মালামাল কোথা হতে পাওয়া গেছে তা তিনি জানেন না এবং তাকে স্বাক্ষর করতে বলায় তিনি জব্দতালিকায় স্বাক্ষর করেছেন। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, মেয়েটি আত্মহত্যা করে বলেও শুনেছি। তিনি আরো বলেন যে, পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ভিকটিমকে উদ্ধার করে বলে শুনেছি। তবে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪ নং সাক্ষী (পি. ডাব্লিউ-৪) মোঃ কাইয়ুম হোসেন- ও সুলতানপুর নিবাসী। যাকে রাষ্ট্রপক্ষ টেন্ডার করে। আসামী পক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে বলে তিনি শুনেছেন এবং ঘটনার পরে পুলিশ আসলে পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে ভিকটিমকে উদ্ধার করে, যা তিনি দেখেছেন এবং ওই সময় বাদীসহ বাদীর পিতা সবাই উপস্থিত ছিল। তবে তার মতে পুলিশের কাছে তিনি কোনো জবানবন্দি দেন নাই।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-৫) আঃ খালেক- ও সুলতানপুর নিবাসী যাকে রাষ্ট্রপক্ষ টেন্ডার করে। আসামীপক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, পুলিশ যখন ভিকটিমের বাড়িতে যায় তখন তিনি ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ওই সময় ভিকটিমের রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, যার জন্য পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে ভিকটিমকে মৃত ও পোড়া অবস্থায় উদ্ধার করে। আসামীদের জেরায় তিনি আরো বলেন যে, আসামী যশোর আমিনিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় থাকতো এবং পড়াশোনা করতো।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬নং সাক্ষী (পি.ডব্লিউ-৬) মোঃ হায়দার আলী- এজাহারকারীর আত্মীয় তথা মামা। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ ফজরের নামাজের পর এজাহারকারী তাকে ফোনে সালমা অসুস্থ বলে বাড়িতে

যেতে বললে তিনি এজাহারকারী (পি.ডাব্লিউ-১), ফারুক এবং ইউনুস (পি.ডব্লিউ-২) মিলে সুলতানপুর গ্রামে সালমার বাড়িতে যান এবং গিয়ে দেখেন সালমার শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার স্বামী তিতুমীর ও তিতুমীরের পিতা- আইয়ুব আলী পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং তিনি মৃত পোড়া অবস্থায় সালমাকে দেখেন। ওই লাশ দেখার সময় তিনি শুনেছেন যে, সালমার নিকট পালসার মোটর সাইকেল যৌতুক হিসাবে না পেয়ে আসামী ও তার পিতা সালমার গায়ে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

আসামী পক্ষের জেরায় তিনি বলেন, যেই মোবাইল নাম্বারে তিনি সংবাদ জেনেছেন তা সেভ করা নাই বলে তিনি নাম্বারটি বলতে পারবেন না। তিনি আরো বলেন যে, ঘটনার দিন ভোর ৫.০০ ঘটিকায় তিনি মোবাইল কল পান এবং তার বাড়ি থেকে সুলতানপুর ১০/১৫ কি.মি. দূরে। তবে তিনি যে পিকআপে করে ঘটনাস্থলে যান সেই পিকআপের নাম্বার বলতে পারবেন না বলে জানান। তবে তিনি জানান যে, পিকআপের চালকের নাম ভজা। তিনি আরো জানান যে, আসামীদের বাড়িতে তিনি সকাল ০৭.৩০ ঘটিকায় পৌঁছান এবং পৌঁছাইয়া ২০/২৫ জন লোক দেখেন। তখন লাশ আসামীদের বাড়িতে রেখেই তিনি বাড়ি চলে আসেন। তবে তিনি ওই বাড়িতে থাকাকালেই থানা থেকে পুলিশ এসে লাশ নিয়ে যায়। আসামীপক্ষ কর্তৃক ভিকটিম আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মর্মে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্নের দাবীটি তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন এবং তিনি আরো অস্বীকার করেন যে, এজাহারকারীর আত্মীয় বলে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭ নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-৭) আব্দুল খায়ের মোড়ল- তার সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ সালমা খাতুনের সুরতহাল প্রস্তুত করার সময় তিনি দেখেন এবং তাতে পুলিশ তার স্বাক্ষর নেয়। সেমতে তিনি সুরতহালে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-২/২) প্রমাণ করেন। আসামীপক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, ঘটনাস্থল

থেকে তার বাড়ি ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি আরো বলেন যে, সুরতহাল প্রতিবেদন যদিও তাকে পড়ে শুনানো হয়নি, তবে তিনি সব দেখেছেন এবং পুলিশ স্বাক্ষর করতে বললে তিনি তাতে স্বাক্ষর করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নং সাক্ষী (পি.ডব্লিউ-৮) আঃ মান্নান শেখ- ছিলেন সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। সেমতে তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ যশোরের কোতয়ালী থানায় এস.আই হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় তিনি জি.ডি নং ৪৪৮ তারিখ ০৮/০৭/২০১২ মূলে ও.সি সাহেবের নির্দেশে ভিকটিম সালমা খাতুনের স্বামী তথা আসামীর বসত বাড়িতে হাজির হন এবং উপস্থিত সাক্ষীদের মোকাবেলায় আসামীর শয়ন কক্ষের দরজা ভেঙ্গে ঐ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ভিকটিম সালমার মৃত দেহ পোড়া অবস্থায় উদ্ধার করেন এবং সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। সেমতে তিনি সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) এবং তাতে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-২/৩) প্রমান করেন। তৎপর তিনি মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য মরদেহ যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেন। পরবর্তিতে ভিকটিমের পিতা (পি.ডব্লিউ-১) থানায় এজাহার দায়ের করলে ও.সি সাহেব মামলার তদন্তভার তাকে দেন। তিনি সেমতে ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন, খসড়া মানচিত্র ও সূচিপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। তিনি ঘটনাস্থলের সূচিপত্রসহ মানচিত্র (প্রদর্শনী-৪) এবং তাতে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী- ৪/১) প্রমান করেন। তিনি উক্ত এজাহারের রেকর্ডিং অফিসার ইন্সপেক্টর আব্দুল জলিলের স্বাক্ষর সম্বলিত এফ.আই.আর ফর্ম (প্রদর্শনী-৫) এবং তাতে আঃ জলিলের স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-৫/১ এবং ৫/২) সনাক্ত করেন। এজাহারের মার্জিনে রক্ষিত আঃ জলিলের আরো দুইটি স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-৩/২ ও ৩/৩) সনাক্ত করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন যা প্রদর্শনী-১ এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/৩। জব্দকৃত আলামতসমূহ, তথা- বোতলের পোড়া অংশ, জায়নামাজের পোড়া অংশ ও পুরাতন কম্বলের পোড়া অংশ তিনি যথাক্রমে বস্তু প্রদর্শনী-I, II ও III হিসাবে প্রমান করেন।

তিনি সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মতামত সংগ্রহ করেন। লাশের সুরতহাল প্রস্তুতপূর্বক কনস্টেবল রুহুল আমিন গাজির মাধ্যমে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট যশোর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেমতে তিনি লাশ পাঠানোর চালান (প্রদর্শনী-৬), তাতে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-৬/১) এবং তাতে তিনি রুহুল আমিন গাজির স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-৬/২) প্রমাণ ও সনাক্ত করেন। তিনি আসামী আব্দুল্লাহকে গ্রেফতারপূর্বক আদালতে সোপর্দ করেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্তপূর্বক সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সাক্ষীদের বক্তব্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় আসামী আব্দুল্লাহ এবং তার পিতা আইয়ুব আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কোতয়ালী মডেল থানায় অভিযোগ পত্র নং-১০৮৬, তারিখ ০৫/১১/২০১২ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১(ক)/৩০ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তিনি সেমতে আসামী আব্দুল্লাহকে ডকে সনাক্ত করেন এবং বলেন যে, অপর আসামীরা অব্যাহতি পেয়েছে।

আসামী পক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ ১৮টা ২০ মিনিটে এফ.আই.আর দাখিল হয় এবং তিনি এফ.আই.আর দাখিল হওয়ার পূর্বেই ঘটনাস্থলে ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ ভোর বেলা যান। তবে কয়টায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেন তা তিনি তার কাছে সি.ডি না থাকায় বলতে পারেননি। ভিকটিমের বুকের উপর বৈদ্যুতিক পাখা পড়ে ভিকটিম মারা গেছে মর্মে তথ্য পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান মর্মে আসামীপক্ষের দেয়া ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন তিনি সঠিক নয় বলে জানান। তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে, খসড়া মানচিত্র ও সূচীতে কোন্ গ্রাম, কার বাড়ি, কার ঘর তা তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি স্বীকার করেন যে, যদিও তিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মতামত গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে সাক্ষী রাখেননি। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, আসামীকে রিমান্ডে নেয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, তবে আদালতে

সি.ডি না থাকায় তা তিনি পরিষ্কার বলতে পারবেন না। তিনি আসামীপক্ষের জেরায় স্বীকার করেন যে, তার তদন্তে মামলা আংশিক মিথ্যা প্রমানিত হয় তা কিছুটা সত্য। তবে তিনি অস্বীকার করেন যে, তিনি প্রভাবিত হয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-৯) মোঃ রেজাউল হাসান- তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ০২/০৩ ঘটিকার সময় আসামী তিতুমীরের বাড়িতে ঘরের মধ্যে ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন যে, অত্র আসামী তার স্ত্রী সালমাকে পুড়িয়ে মেরেছে বলে তিনি শুনেছেন এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি ভয়ে লাশ দেখেননি। তবে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে পোড়া ঘর দেখেছেন। তিনি আরো বলেন যে, তিনি ঘটনাস্থলে থাকাবস্থায় পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তাতে তার স্বাক্ষর নেয়। তিনি সেই মর্মে সুরতহাল প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-২/৪) প্রমান করেন। তিনি আরো বলেন যে, ঘটনার গ্রামের চেয়ারম্যান এবং তিনি শুনেছেন যে, তিতুমীর যৌতুক বাবদ ভিকটিমের কাছে টাকা দাবী করে না পেয়ে ভিকটিমকে ইচ্ছা করে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

আসামী পক্ষের জেরায় তিনি বলেন যে, আসামী যৌতুক চেয়েছে তা তিনি শুনেছেন, তবে ভিকটিমের লাশ তিনি দেখেননি। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, সাক্ষীদের সাহায্যে ঘটনার ঘরের দরজা খুলে মৃতার মৃতদেহ উদ্ধার করার কথা সুরতহাল প্রতিবেদনে লেখা আছে ঠিক। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, ঘটনার ঘরটি তিনি পোড়া অবস্থায় এবং কিছু ভাঙ্গা অবস্থায় দেখেছেন যা টালির ঘর ছিল এবং ঘটনার সময় ঐ ঘর ভাঙ্গা ছিল কি না তা খেয়াল নাই। তিনি আরো বলেন যে, তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছাবার প্রায় ১ ঘন্টা পর পুলিশ আসে এবং পুলিশকে কে খবর দেয় তা তিনি জানেন না। তিনি বলেন যে, তিনি ইউ.পি চেয়ারম্যান হিসাবে সাক্ষ্য দিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ১০ নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-১০) আঃ মান্নান তরফদার- তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত্র ২/৩ টার দিকে ঘটনা তিতুমীরের শয়ন কক্ষের ঘরে ঘটে। তিনি ঘটনা শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতার লাশ পোড়া অবস্থায় আসামীর বাড়িতে দেখেন। তিনি আরো বলেন যে, ঐ সময় পুলিশ এসে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তাকে পড়ে শোনানো হয় এবং তা তিনি স্বাক্ষর করেন। সে মর্মে তিনি সুরতহাল রিপোর্টে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-২/৫) প্রমান করেন। তিনি আরো বলেন যে, ঐ সময়ে তিনি শুনেছেন যে আসামী তিতুমীর ভিকটিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করেছে। তিনি আরো বলেন যে, তার বাড়ি হতে ঘটনাস্থল ৫/৭ মাইল দূরে হবে এবং তিনি ভোর ৬.০০ টার দিকে মোবাইল ফোনে খবর পান। তিনি বাদীর আত্মীয় নয় বলে জানান এবং তাকে বাদীর আত্মীয় হিসাবে লেখা দারোগার ভুল বলে জানান। তিনি আরো জানান যে, এজাহারকারী তাকে মোবাইল ফোন করেছিল এবং তিনি আধা ঘন্টার মধ্যে মোটর সাইকেলে করে ঘটনাস্থলে পৌছান। যখন তিনি ঘটনাস্থলে যান তখন ঘরের মধ্যে লাশ একটি হালকা কাপড়ে ঢাকা ছিল এবং তখন আগুন নিভে গেছে। তিনি ঘটনাস্থলে ৩০০ লোক দেখেন এবং বলেন যে, ঘটনার ঘরটি টিন শেড পাকা ঘর ছিল। তিনি ঘরের মধ্যে ফ্যানসহ বেশ কিছু পোড়া দেখেন এবং বলেন যে, পুলিশ সকাল ৭.০০ ঘটিকার মধ্যে ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি অস্বীকার করেন যে, বাদীর আত্মীয় বলে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপক্ষে ১১ নং সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-১১) ডাঃ কল্লোল কুমার সাহা- একজন আনুষ্ঠানিক সাক্ষী যিনি ডাক্তার হিসাবে মৃতার লাশের ময়নাতদন্ত করেছেন। তার সাক্ষ্য অনুযায়ী ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখে তিনি যশোরের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন এবং ঐ দিন দুপুর ২.১০ ঘটিকায় কনস্টেবল রুহুল আমিন হাজির হয় এবং তার সনাক্ত মতে মৃতা সালমা খাতুনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এই সাক্ষী গ্রহণ করেন। ময়নাতদন্ত করে তিনি নিম্নলিখিত জখমগুলি পানঃ-

1. Burn whole Body including hair (scalp) except sole of foot (both).
2. Congestion on Right side of Scalp.

মাথার খুলি ঃ Scalp Burn, Skull intact.

বক্ষমূল ঃ Ribs intact, Congested, Trachea Congested ডান ও বাম ফুসফুস Congested. হৃদপিন্ড Healthy; রক্তনালী Healthy.

উদর ঃ উদরের ঝিল্লি Congested.

শ্বাসনালী ঃ lips Burn. Oesophagus, Healthy ৪, ৫, ৬ কলাম Congested.

lever ঃ Pale.

প্লীহা-Pale.

মুত্রাশয় ঃ Congested.

মুত্রাথলি ঃ Empty Healthy.

প্রজনন অঙ্গ ঃ Vulva Burn Uterus-Foetus.

মাংশ পেশী- হাড় জখম- Described.

এবং মৃত্যুর কারন হিসাবে তার নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেন,

"In my opinion death was due to Hypovolumic shock resulting from extensive burn which was antemortem in nature."

তিনি সে মর্মে মৃতা সালমা খাতুনের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-৭) এবং তাতে তার সীলযুক্ত স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-৭/১) প্রমান করেন এবং সিভিল সার্জন ডাঃ আতিকুর রহমান এর স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-৭/২) সনাক্ত করেন।

আসামী পক্ষের জেরায় তিনি স্বীকার করেন যে, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষরের নীচে কোনো তারিখ লেখা নাই এবং বলেন যে, সিভিল সার্জন ৭/১০ তারিখ তাতে স্বাক্ষর করেন। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, হত্যা হলে

“Homicidal in nature” উল্লেখ করা হয় এবং তিনি শুধু ante-mortem বলেছেন। জেরায় আরো বলেন যে, রিপোর্ট অনুযায়ী ২০% Fluid ও Blood বন্ধ হয়ে গেছে এটা বলা যায় না, তবে Structurally হৃদপিন্ড, রক্তনালী, হৃদারা ঝিল্লি Healthy ছিল। তিনি আরো বলেন যে, পাকস্থলী এবং উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহ Healthy এবং Food Particles ছিল। তিনি মৃতার কোনো অস্থি ভঙ্গ পাননি। তিনি অস্বীকার করেন যে, তিনি সঠিকভাবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করেন নাই।

৪.আইনজীবীগণের বক্তব্যঃ

৪.১ উপরোক্ত সাক্ষী এবং অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনার পূর্বে দেখা যাক বিজ্ঞ আইনজীবীগণ কি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য নিচে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা গেল এবং আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আসামী আপীলকারী পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য প্রথমে উল্লেখ করা গেলঃ-

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সরওয়ার আহমেদ, আসামী আপীলকারীর পক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রদান করেনঃ

(১) অন্ততঃ দুই জন সাক্ষী, তথা পি.ডাব্লিউ-৪ এবং ৫, বলেছেন যে, আসামীর বসত ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, যা ভেঙ্গে ঢোকা হয়। পি.ডাব্লিউ-৩ ও বলেছেন যে, আসামীর বসত ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢোকা হয়। এমনকি তদন্তকারী কর্মকর্তা ও (পি.ডাব্লিউ-৮) তার সাক্ষ্যে বলেছেন বলেছেন যে, দরজা ভেঙ্গে তিনি আসামীর বসত ঘরে প্রবেশ করেছেন। সুতরাং, প্রতীয়মান হয় যে, দরজা বন্ধ ছিল এবং ভিকটিম গায়ে আগুন লাগিয়ে নিজেকেই হত্যা করেছেন।

(২) প্রসিকিউশন পক্ষ হত্যাকান্ড হয়েছে সেই মর্মে কোনো নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারেনি। সুতরাং, হত্যাকান্ড প্রমাণ করতে না পারায় কোনোভাবেই আসামীকে ১১(ক) ধারায় শাস্তি দেয়া আইনসঙ্গত হয়নি। সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) প্রদর্শনপূর্বক তিনি উল্লেখ করেন যে, যদিও উক্ত সুরতহাল রিপোর্টে যৌতুক দাবী তথা আসামীর উপস্থিতি এবং আসামীর আগুন আগুন বলে চিৎকার দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে, কোনো জব্দতালিকার সাক্ষী এই কথাগুলো আদালতে সমর্থন করেনি। এমনকি সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি.ডাব্লিউ-৮)- ও এই মর্মে কোনো সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেননি। সুতরাং সুরতহাল প্রতিবেদনের উক্ত বক্তব্য সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী সাক্ষ্য নয়। সেহেতু পি.ডাব্লিউ-৮ কর্তৃক লিখা সুরতহাল রিপোর্টের সেই বক্তব্য কোনোভাবেই সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং উক্ত বক্তব্যের উপর আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। এর সমর্থনে তিনি এরশাদ শিকদার মামলার (৫৬ ডি.এল.আর (২০০৪) পৃষ্ঠা-১৮৫) প্যারা ২৭ এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, পুলিশ কর্তৃক তদন্ত এবং সেই তদন্তে প্রস্তুতকৃত সুরতহাল যেহেতু ফৌজদারী কার্যবিধির ৪(এন) অনুযায়ী বিচারিক কার্যক্রম নয়, সেহেতু জব্দতালিকার উক্ত বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আদালত কোনোভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, বিশেষত সুনির্দিষ্টভাবে যখন সেই বক্তব্য কোনো সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করেনি এবং আসামী পক্ষ ঐ বক্তব্য সম্পর্কে কোনো সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ পাননি।

(৩) রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, আসামী আপীলকারী যে ঘটনার সময় ঘটনার ঘরে উপস্থিত ছিল তা রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং, এই মামলায় সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা অনুযায়ী কোনোকিছু প্রমান করার দায়িত্ব আসামীর উপর বর্তায় না। কারণ, এই মামলাটি একটি সচরাচর কথিত স্ত্রী হত্যা মামলা নয় বরং এই মর্মে সাক্ষ্য এসেছে যে, ভিকটিম ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় নিজেকে নিজে পুড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে।

(৪) রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষের অন্তত একজন সাক্ষী বলেছেন যে, এই আসামী মাদ্রাসায় থাকতো বা যশোর থাকতো এবং একাধিক সাক্ষী বলেছেন যে, ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে বলে তারা শুনেছেন। সুতরাং, তার মতে ঐ সমস্ত সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা না করায় তাদের সাক্ষ্য কোনোভাবেই বিবেচনার বাহিরে রাখা সম্ভব নয়।

(৫) যেহেতু রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যের মাধ্যমে একটি সমূহ সম্ভাবনা দেখা যায় যে, আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না এবং ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে, সেহেতু এই ধরনের সন্দেহের সুবিধা আসামীর সুবিধা এবং তা আসামীপক্ষ পাবে এবং সেই কারণে আসামী এই মামলায় খালাস পাওয়ার যোগ্য।

৪.২ উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে জনাব হারুনুর রশীদ, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেনঃ

(ক) সুরতহাল প্রতিবেদনের সমস্ত বক্তব্য Substantive Evidence হিসাবে গ্রহণ করার আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে। সুতরাং, সুরতহাল প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-২) ঘটনার

সময়ে ঘটনাস্থলে আসামীর উপস্থিত থাকা, ভিকটিম ভাত খেয়ে রাত্রিকালে শয়ন কক্ষে যাওয়া, মৃতার স্বামী আগুন আগুন বলে চিৎকার করা ইত্যাদি বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে এবং এই সমস্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, আসামী ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল। যেহেতু সে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বীকৃতভাবেই সে ভিকটিমের স্বামী ছিলো, সেহেতু সাক্ষ্য আইনের ১০৬ নং ধারা অনুযায়ী তাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে তার স্ত্রী তার হেফাজতে থাকাবস্থায় কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছে, যা তিনি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে আমাদের উচ্চ আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনী অনুমান এই হবে যে, আসামী তার স্ত্রীকে যৌতুকের দাবীতে হত্যা করেছে। তার উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের Rameshwar Dayal Vs. State of UP, AIR 1978 (SC)(1558) মামলার প্যারা নং ৩২-৩৯ পর্যন্ত পড়ে শোনান এবং বলেন যে, যেহেতু সুরতহাল প্রতিবেদনের লিখিত বক্তব্য ঘটনার পর পর প্রথম বক্তব্য এবং তা প্রথম উদ্‌ঘাটিত তথ্য, সেহেতু উক্ত রায়ের আলোকে তা সরাসরি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে যে, আসামী ঘটনার সময় ঘটনার বসত ঘরে তার স্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিল।

(খ) যেহেতু ঘটনার সময় ঘটনার বসত ঘরে ভিকটিম ব্যতিত শুধুমাত্র আসামী উপস্থিত ছিল, সেহেতু আসামীকেই ব্যাখ্যা করতে হবে সে সেই হত্যাকান্ড যৌতুকের দাবীতে করে নাই। যেহেতু সে তা ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সেহেতু আবারো আইনী

অনুমান হবে এই যে, আসামী যৌতুকের দাবীতেই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

(গ) আসামী পক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, আসামী পক্ষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলিবাই দিয়েছেন একবার বলেছেন আসামী যশোর আলিয়া মাদ্রাসায় ছিল, আরেকবার বলেছেন আসামী যশোরে মামার বাড়িতে ছিল এবং আরেকবার বলেছেন ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কোনো এলিবাইই আসামী পক্ষ প্রমান করার জন্য কোন সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করেনি। সুতরাং, এ রকম ভিন্ন ভিন্ন এলিবাই থেকে বোঝা যায় যে, আসামীর দোষী মন ছিল এবং সে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে এবং যেহেতু আসামী উক্ত ঘটনার সময় ঘটনাস্থল বাড়িতে উপস্থিত ছিল সেহেতু তাকেই উক্ত এলিবাইসমূহ প্রমান করতে হবে। তার এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের Mahabur Sheikh vs State, 67 DLR (AD)(2015)-54 মামলার রায়টি উল্লেখ করেন।

(ঘ) ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে না হত্যা করা হয়েছে- এই মর্মে তিনি স্বীকার করেন যে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে সরাসরি ‘Homicidal’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। তিনি বলেন যেহেতু আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, সেহেতু আসামীকেই প্রমাণ করতে হবে যে এটি ‘Homicidal’ ছিল না। উক্ত প্রমাণের অভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এটি ‘Homicidal’ তথা নর হত্যাজনিত মৃত্যুই ছিল।

(ঙ) যেহেতু ঘটনার বসত ঘরের বিছানায় ভিকটিমকে পা ঝোলানো রেখে শোয়া অবস্থায় পাওয়া যায়, সেহেতু এটি কোনোভাবেই

আত্মহত্যার ঘটনা নয়। বরং এ থেকে বোঝা যায় যে, ভিকটিমকে হত্যা করে বিছানায় কেউ বা কারা পা ঝুলিয়ে শায়িত করে রেখেছে, সুতরাং, তিনি এই মামলায় আসামীর মৃত্যুদন্ড বহাল রাখায় এবং তা অনুমোদন দেয়ার জন্য প্রার্থনা করেন।

৫. সাক্ষ্য পর্যালোচনা ঃ

৫.১ স্বীকৃতভাবে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে ২০০০ ইং সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (উক্ত আইন) এর ১১(ক) ধারায় যেখানে যৌতুকের দাবীতে হত্যাকান্ডের জন্য একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। অভিযোগটি যৌতুকের দাবীতে হত্যাকান্ড।

৫.২ এখানে যদি সচরাচর স্ত্রী হত্যা মামলায় ব্যবহৃত সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা অনুযায়ী ঋণাত্মক দায় নীতি প্রযোজ্য না হয়, রাষ্ট্রপক্ষকে দুটি বিষয় যুক্তিসংগত সন্দেহ বহির্ভূতভাবে প্রমান করতে হবে। তা হলো একটি নরহত্যাকান্ড ঘটেছে এবং এই নরহত্যাকান্ডটি যৌতুকের দাবীতে ঘটানো হয়েছে। আর যদি এখানে সাক্ষ্য আইনের ঋণাত্মক দায় নীতিমালাটি প্রযোজ্য হয়, সেক্ষেত্রে আসামীকেই প্রমাণ করতে হবে যে এখানে নরহত্যাকান্ড ঘটেনি এবং ঘটে থাকলেও তা যৌতুকের দাবীতে ঘটেনি। তবে এই ঋণাত্মক দায় নীতিমালাটি প্রযোজ্য হওয়ার পূর্বে দুটি প্রাথমিক বিষয় রাষ্ট্রপক্ষকে যুক্তিসংগত সন্দেহ বহির্ভূতভাবে প্রমাণ করতে হবে। তা হলো মামলায় নিহত ব্যক্তিটি বা ভিকটিম আসামীর হেফাজতে ছিল এবং ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে আসামী এবং ঐ ভিকটিম একত্রে ছিল। সেইক্ষেত্রে এটি যে তথাকথিত স্ত্রী হত্যাকান্ড (Wife Killing Case) নীতিমালা অর্থাৎ ঋণাত্মক দায় নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তাহলে প্রথমে দেখা যাক, ভিকটিম আসামীর হেফাজতে ছিল এবং

ঘটনার সময় আসামী ভিকটিমের সাথে ঘটনাস্থলে ছিল-এই বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে পেরেছে কিনা।

৫.৩ আমরা রাষ্ট্রপক্ষের সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যগুলো এবং তাদের জেরাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেছি। যেহেতু এটি একটি মৃত্যুদন্ড অনুমোদনের মামলা সেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে জেরা (contradiction) করা না হলেও, আমরা কেস ডায়েরীতে রক্ষিত ঐ সাক্ষীদের প্রদত্ত **১৬১** ধারার জবানবন্দি ও পর্যালোচনা করেছি। উক্ত পর্যালোচনার কোথাও আমরা পাইনি যে, কোনো একজন সাক্ষী বলেছেন যে ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় বা ঘটনার অব্যবহিত পরে তিনি বা কেউ একজন আসামীকে ঘটনাস্থলের বসতঘরে বা বসতঘরের আশেপাশে দেখেছেন। কোনো সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেনি যে, ঘটনা ঘটার রাতে বা ভোরে ভিকটিম স্ত্রী হিসাবে আসামীর হেফাজতে ছিল। বরঞ্চ রাষ্ট্রপক্ষের অন্ততঃ একজন সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-৫) বলেছেন যে, আসামী যশোরে মাদ্রাসায় থাকতো এবং একাধিক সাক্ষী (পি.ডাব্লিউ-৫) বলেছেন যে, ভিকটিম আত্মহত্যা করেছে বলে তিনি শুনেছেন। এই সমস্ত সাক্ষীদেরকে রাষ্ট্রপক্ষ বৈরি ঘোষণা করেনি এবং তাদেরকে কোনোভাবেই জেরা করেনি। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের যে কয়জন সাক্ষী ঘটনার অব্যবহিত পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে (যেমন- পি.ডাব্লিউ ৩, ৪, ৫, ৬, ৯ এবং ১০), তারা কেউ আদালতে এমনকি পুলিশকেও বলেননি যে, তারা আসামীকে পালিয়ে যেতে বা অন্য কোনোভাবে আসামীকে ঘটনাস্থল বা ঘটনাস্থলের আশেপাশে দেখেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, তারা আসামীর পিতা আইয়ুব আলীকে দেখেছেন, যাকে পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫ সি ধারায় অত্র মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় এবং যা রাষ্ট্রপক্ষ উচ্চতর আদালতে চ্যালেঞ্জ করেনি।

<u>সুরতহাল প্রতিবেদনের তথ্যঃ</u>

৫.৪ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত একটি কাগজ যাকে আমরা সুরতহাল প্রতিবেদন বলি, তা প্রদর্শনী-২ হিসাবে প্রমাণিত ও চিহ্নিত হয়েছে পি.ডাব্লিউস-১, ২, ৩, ৭, ৮, ৯ ও ১০ আদালতে প্রমাণ করেছেন বা তাতে তাদের স্বাক্ষর সনাক্ত করেছেন। উক্ত সুরতহাল প্রতিবেদন অনুসারে ঘটনার সময় আসামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল মর্মে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেহেতু সুরতহাল প্রতিবেদনের উক্ত ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে এই মামলায় বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং আসামীপক্ষের আইনজীবীর মধ্যে বেশিরভাগ সময় বক্তব্য-পাল্টা বক্তব্য হয়েছে, সেহেতু সম্পূর্ণ সুরতহাল প্রতিবেদনটি, যা স্বীকৃতভাবে পি.ডাব্লিউ-৮ প্রস্তুত করেছেন, তা হুবহু নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

> *"আমি S.I. আঃ মান্নান শেখ সঙ্গীয় কং-১০৭৩ মোঃ বাবর আলী কং/৪৬৩ আবুল কাসীম আনছার সদস্য/১২০৬৭ বাবুল ড্রাই কং/মোঃ আমিরুল ইসলাম সর্ব থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর এবং হাসপাতালে কর্মরত কং/৯২২ মোঃ রুহুল আমিনদের সহকারে রাত্রীকালীন মোবাইল-১১ নাইট ডিউটি করাকালে অদ্য ০৯/০৭/২০২১ ইং তারিখ সকাল ৭.৪৫ ঘটিকার সময় বেতার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে সরকারী গাড়িযোগে সুলতানপুর গ্রামের দক্ষিণ পাড়া (বাবু পাড়া) জনৈক আইয়ুব আলী (৫০) পিং- মৃতঃ নুর মোহাম্মাদের বসত বাড়ির উত্তর পোতার দক্ষিণমুখি ১ কক্ষ বিশিষ্ট সেমী পাকা টালীর ছাউনীর ও চালা ঘরের মধ্যে পার্শ্বে লিখিত সাক্ষী ও সনাক্তকারীগণের সনাক্ত মতে এবং মৃতার পিতা- কবির হোসেনের দেখানো মতে মৃতঃ সালমা খাতুন (২২) পিং- মোঃ কবির হোসেন, স্বামী- মোঃ তিতুমীর (আব্দুল্লাহ) এর সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করিলাম। প্রস্তুতের সময় ৮.৪৫ ঘটিকা।*
>
> *উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক মৃতার মৃতদেহটি একটি কাঠের চৌকির উপর পশ্চিম শিহরী চিৎ অবস্থায় ২টি পা ঝুলানো মেঝেতে লাগানো অবস্থায় পাইলাম। অনুমান বয়স ২০ বছর হবে। তার শরীরে মাথা থেকে পা খানা পর্যন্ত সমূদয় অঙ্গ-প্রতঙ্গও অংশ আগুনে পোড়ানো ছাল যাওয়া কালশিরার দাগ আছে। মুখ-মন্ডল বিকৃত ও দাঁত দেখা যায়। ২ হাত ২ দিকে*

বাকী ও নখগুলি অর্ধ্বমুষ্টি অবস্থায় পাই। তার শরীরের কোথাও কাপড় নাই; আগুনে পুড়িয়া ছাই হওয়ার দৃশ্য পাইলাম। শরীরের গড়ন স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য হালকা-পাতলা।

মৃতার পিতা-কবির হোসেনের নিকট থেকে তথ্য পাওয়া যায়, প্রায় দেড় বছর পূর্বে সম্পূর্ণ সামাজিকভাবে উভয় পক্ষের সম্মতি হয়ে বিবাহ হয়। বিবাহের পর মৃতা সালমা ও তিতুমীর এর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। মৃতা অনুমান ৫/৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হলেও তাদের দাম্পত্য জীবনে কলহ দ্বন্দ্ব ছিল। স্থানীয় প্রতিবেশী ও মৃতার শ্বশুর শাশুড়ির ভাষ্য মতে তথ্য পওয়া যায় ০৮/০৭/২০১২ ইং তারিখ সন্ধ্যা রাত্রী সাড়ে ১০/১১ ঘটিকার সময় রাত্রীকালীন খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া মৃতা তার স্বামীসহ শয়ন কক্ষে ঘুমানোর জন্য যায়। হঠাৎ করিয়া ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত্রী ২.০০-২.৩০ ঘটিকার সময় মৃতার স্বামী আগুন আগুন করিয়া চিৎকার দিয়ে মাতা-মোছা নুরজাহান ও পিতাদের সংবাদ দেয়। কতক লোকজন দ্রুত এগিয়ে যায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন। সালমা চৌকির উপর আগুনে পুড়িয়া যায়। মারা যায়। পরিবারের লোকজন পালাইয়া যায়। স্বাক্ষীদের সাহায্যে শয়ন কক্ষের দরজা খুলিয়া মৃতার মৃত দেহসহ ও কেরোসিন জাতীয় পদার্থের গন্ধ পাওয়া যায়। আমার গোপনে ও প্রকাশ্যে তদন্তে ও এলাকার সাধারণ লোকের গুঞ্জনের ভিত্তিতে এবং মৃতার অভিভাবকদের ভাষ্য মতে ধারণা করা হইতেছে সালমা খাতুনকে শ্বাস রোধ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া কিংবা কেরোসিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া হত্যা করিয়াছে। তথাপিও মৃতার মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য কং/৯২২ মোঃ রুহুল আমিন গাজী এর মাধ্যমে মৃতদেহটি RMO ২৫০ শয্যা বিঃ জেঃ হাঃ যশোর বরাবরে চালান কপি মোতাবেক প্রেরণ করিলাম। ময়না তদন্ত শেষে একটি মতামত দানে মর্জি হয়।"

(গুরুত্বের খাতিরে আন্ডার লাইন দেয়া গেল)

৫.৫ উপরে বর্ণিত সুরতহাল প্রতিবেদনের তৃতীয় প্যারায় পি.ডাব্লিউ-৮ লিখেছেন যে, আসামী এবং মৃতা সালমার বিবাহের পর মৃত সালমা ৫/৬

মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে কলহ ছিল। তিনি স্থানীয় প্রতিবেশী ও মৃতার শ্বশুর শাশুড়ির ভাষ্য মতে তথ্য পেয়েছেন যে, ০৮/০৭/২০১২ ইং তারিখ সন্ধ্যা রাত্রী ১০/১১ ঘটিকার সময় রাত্রীকালীন খাওয়া দাওয়া শেষ করে মৃতা সালমা তার স্বামীসহ শয়ন কক্ষে ঘুমানোর জন্য যায় এবং হঠাৎ করে ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখ রাত (ভোর রাত হবে) ২.০০-২.৩০ ঘটিকার সময় আসামী আগুন আগুন বলে চিৎকার দিতে থাকে এবং তার মাতা মোছাঃ নুরজাহান ও পিতাকে সংবাদ দেয়। তখন কতক লোক দ্রুত এগিয়ে আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে সালমা চৌকির উপর আগুনে পুড়ে মারা যায় এবং পরিবারের লোকজন পালিয়ে যায়। তিনি আরো লেখেন যে, তিনি সাক্ষীদের সাহায্যে শয়ন কক্ষের দরজা খুলে মৃতার দেহসহ কেরোসিন জাতীয় পদার্থের গন্ধ পান। তিনি আরো লেখেন যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য তদন্তে ও এলাকার সাধারণ লোকের গুঞ্জনের ভিত্তিতে এবং মৃতার অভিভাবকের ভাষ্য মতে তার ধারণা হয়েছে যে, সালমা খাতুনকে শ্বাসরোধ করে আগুনে পুড়িয়ে কিংবা কেরোসিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে।

৫.৬ সুরতহাল প্রতিবেদনের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজ্ঞ ডি.এ.জি মহোদয় বলতে চেয়েছেন যে, সুরতহাল প্রতিবেদনে পি.ডাব্লিউ-৮ এর এই বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর মতে এটি আইনের বাধ্যবাধকতা। এই মর্মে তিনি উপরোল্লিখিত ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের Rameshwar Dayal কেসটির উদ্ধৃতি দেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগ ও নিম্ন আদালত কর্তৃক অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন নিম্ন আদালত কর্তৃক অনুসরণ করা বাধ্যতামুলক। তবে

আমাদের উচ্চ আদালতের কিছু কিছু রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদেশী উচ্চ আদালতের রায়গুলোকে প্রভাব সৃষ্টিকারী নজির (Persuasive precedence) হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যদি তা আমাদের আদালত কর্তৃক ঘোষিত কোনো রায়ের সাথে বা আইনের সাথে তা সংঘাতপূর্ণ না হয়। সুরতহাল প্রতিবেদনের উপরোক্ত বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে কি হবেনা সেই মর্মে আমাদের দেশের উচ্চ আদালতের তেমন কোনো রায় আমরা খুঁজে পাইনি। বিজ্ঞ আইনজীবীগণও এই মর্মে কোনো রায় আমাদেরকে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব সরওয়ার আহম্মেদ হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চের একটি রায়-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা *এরশাদ শিকদার* মামলার রায় হিসাবে বিখ্যাত (৫৬ ডি.এল.আর, পৃষ্ঠা-১৮৫)। উক্ত রায় থেকে দেখা যায়, উক্ত মামলার রায়ের লেখক (Author Judge) বিচারপতি এস. কে সিন্‌হা মহোদয় (যিনি তখন হাইকোর্ট বিভাগের মামনীয় বিচারপতি ছিলেন এবং পরবর্তিতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন) বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে প্যারা নং ২৭ এ নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেনঃ

> *"Section 35 of the Evidence Act renders a document admissible if three conditions are satisfied. First of all, the entry that is relied on must be one in any public or other official book, register or record, secondly, it must be an entry stating a fact in issue or relevant fact, and thirdly, it must be made by a bublic servant in discharge of his official duty or any other person in performance of a duty specially*

enjoined by law. The entry referred above will be of a permanent nature and excludes all such writings as are merely of an ephemeral character. The statements in public documents as mentioned above are receivable to prove the facts stated on the general ground that they were made by the authorised agents of the public in course of official duty and respecting facts, which were of public interest or required to be recorded for the benefit or the community. A seizure list, a post mortem repoert, a confessional statement recorded under section 164 of the CrPC or any statement of any person recorded under section 161 of the Code not being in public or other official book, register or record, they are not admissible under section 35 of the Evidence Act. The learned Deputy Attorney-General in course of his submission frankly concedes that the seizure lists and the medical reports have been wrongly admitted into evidence in this case. In the case of Mohammad Akib Pali vs Madad Ali and others, PLD 1972 (Karachi) 433 it has been observed, the record of one proceeding is not to be treated as a part of the record of another proceeding and the record of each proceeding should be self-contained and complete. Therefore, we find, the learned Additional Sessions Judge wrongly exhibited the seizure lists,

<u>the medical report and the confessional statement of Nure-e-Alam as documentary evidence is this case</u>."

৫.৭ উক্ত রায়ের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতিগণ সেখানে বলতে চেয়েছেন যে, জব্দতালিকা প্রতিবেদন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি সাক্ষ্য আইনের ৩৫ ধারা অনুযায়ী সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ঐ মামলায় সুরতহাল প্রতিবেদনের লিখিত বক্তব্য সম্পর্কে তেমন কিছু আলোকপাত করা হয়নি। এই বিষয়ে সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে আমরা বিজ্ঞ ডি.এ.জি কর্তৃক প্রদত্ত ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের ***রামেশ্বর দয়াল*** কেসের রায়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে পর্যবেক্ষণ করেছি। উক্ত রায়ের সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তিনি চারটি খোলা গুলির খোসা পেয়েছেন। যদিও তিনি তার সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি চারটি তাজা গুলি পেয়েছেন। তখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল যে, সুরতহাল প্রতিবেদনে তার লেখা যে বক্তব্য সেটি গ্রহণ করা হবে, নাকি আদালতে প্রদত্ত তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেই মামলায় আরো কিছু দালিলিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, চারটি তাজা গুলি পাওয়া গিয়েছিল। তখন ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন মামলার নজির বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা তিনি ভুলবশতঃ দিয়েছেন। কারণ তিনি নিজেই সুরতহাল প্রতিবেদনে লিখেছেন যে, চারটি তাজা গুলি পেয়েছেন, যা আরো কিছু দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। এরকম সিদ্ধান্তে উপনিত হতে গিয়ে তখন আদালত নিম্নোক্ত বক্তব্য দেনঃ

> *“The Investigating Officer does not say in his evidence that this finding of fact in the panchayatnama or the inquest report was incorrect. The statement in the inquest report was made by Investigating Officer soon after the occurrence and was, therefore, the earliest statement regarding a fact which he found and observed. The earlier statement, therefore, is a valuable material for testing the veracity of the witness. (প্যারা-৩২)*

৫.৮ পরবর্তিতে আদালত সুরতহাল প্রতিবেদনে লিখিত চারটি তাজা গুলি সম্পর্কে আরো বলেন যে,

> “*but it is a record of what the Investigating Officer himself observed and found. Such an evidence is the direct or the primary evidence in the case and is in the eye of law the best evidence. Unless the record is proved to be suspect and unreliable, perfunctory or dishonest, there is no reason to disbelieve such a statement in the inquest report*.” *(প্যারা-৩৫)*

৫.৯ ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য রায়ের আলোচনা করে সুরতহাল প্রতিবেদনের কোন বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং কোন বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবেনা। তা এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ঃ

> “*What this Court has said is that the notes in question which are in the nature of a statement recorded by the Police Officer in the course of investigation would not be*

admissible. There can be no quarrel with this proposition. Note No. 4 in Ex.K-18 is not a note which is based on the information given to the Investigating Officer by the witnesses but is a memo of what he himself found and observed at the spot. Such a statement does not fall within the four conrners of S. 162 Cr.P.C. In fact, documents like the inquest reports, sizure lists or the site plans consist of two parts one of which is admissible and the other is inadmissible. That part of such documents which is based on the actual observation of the witness at the spot being direct evidence in the case is clearly admissible under section 60 of the Evidence Act whereas the other part which is based on information given to the Investigating Officer or on the statement recorded by him in the course of investigation is inadmissible under S. 162 Cr.P.C. except for the limited purpose mentioned in that section.

৫.১০ অতএব, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত ***রামেশ্বর দয়াল*** মামলার রায়টি থেকে দেখা যায় যে, সুরতহাল প্রতিবেদনে, জব্দতালিকা ও খসড়া মানচিত্র- যা তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের সময় প্রস্তুত করেন তাতে দুটি অংশ থাকে, যার একটি অংশ সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং অপর অংশটি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবেনা। উক্ত দলিলসমূহের যে অংশে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজস্ব পর্যবেক্ষণ (যা তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিজ চোখে দেখেছেন) তা বলা আছে, তা সাক্ষ্য আইনের ৬০ ধারা

অনুযায়ী সরাসরি সাক্ষ্য (direct evidence) হিসাবে গৃহীত হবে এবং যে অংশটি তিনি বিভিন্ন জনের বক্তব্য শুনে তার ধারণাপ্রসূত হিসাবে লিখেছেন, তা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ঘোষিত এই আইনি নীতিটি বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে মোটেই সমর্থন করে না। কেননা তিনি সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) এর যে বক্তব্যটি (তথা *“স্থানীয় প্রতিবেশী ও মৃতার শ্বশুর শাশুড়ির ভাষ্য মতে তথ্য পওয়া যায়......মৃতার স্বামী আগুন আগুন করিয়া চিৎকার দিয়ে......পরিবারের লোকজন পালাইয়া যায়......”)* সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে বলে বারবার জোরালো বক্তব্য রেখেছেন উক্ত সুরতহাল প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত বক্তব্যটি তদন্তকারী কর্মকর্তার (পি.ডব্লিউ-৮) নিজের দেখা বা প্রত্যক্ষ করা বক্তব্য নয় বরং সেটি তিনি উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য শুনে ধারনাপ্রসূত হয়ে লিখেছেন। ফলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬২ ধারা ও সাক্ষ্য আইনের ৬০ ধারা অনুযায়ী এ তথ্য বা বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে বিচারিক আদালতে গৃহীত হবেনা। সুতরাং, ***রামেশ্বর দয়াল*** কেসের আইনী ব্যাখ্যাটি বরঞ্চ বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায় এবং তা তাঁর বক্তব্যকেই অসার করে দেয়। আসামী ঘটনার বসত ঘরে উপস্থিত ছিল বা আগুন আগুন চিৎকার ইত্যাদি বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তা (পি.ডাব্লিউ-৮) নিজের চোখে দেখেননি। বরঞ্চ তিনি কারো কারো বক্তব্য থেকে শুনে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং যাদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন তারা আদালতে এসে সেই বক্তব্য সমর্থন করেনি। সুতরাং ***রামেশ্বর দয়াল*** মামলার যে আইনী বক্তব্য তা কোনোভাবেই সুরতহাল প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে সমর্থন করেনা। বরং তাঁর সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের বিরোধিতা করে।

৫.১১ আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত আইনী ঘোষণা আমাদের আদালত কর্তৃক মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয় বরং তা প্রভাব সৃষ্টিকারী (Persuasive) নজির। এ রায়টি প্রথমত পড়তে বা শুনতে খুবই আগ্রহ উদ্দীপক মনে হলেও এখানে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে যা না বললেই নয়। যদি এই রায়ের এই বক্তব্য অর্থাৎ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজের চোখে যা দেখেছেন এবং দেখে লিখেছেন তা আমরা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করি, যেখানে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজে আদালতে এসে সেই বক্তব্য দেননি, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়াবে যখন কোনো প্রত্যক্ষদর্শী এজাহারকারী ঘটনা দেখে এজাহার দায়ের করেন এবং সেই এজাহারকারী যদি আদালতে এসে এজাহারের সমর্থনে বক্তব্য না দেন তাহলে কি এজাহারের বক্তব্যও সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে? এ ধরণের বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আলোচনায় আনেননি বা *রামেশ্বর দয়াল* মামলার কোনো পক্ষ তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেননি। তাই এই মামলার রায়টি কতটুকু আমাদের দেশে গ্রহণ করা হবে বা হবে না তা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কোনো বেঞ্চের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। কারণ এই মুহূর্তে আমরা যদি বলি যে এই মামলার এই আইনী বক্তব্যটি আমাদের দেশে প্রযোজ্য হবে, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো না কোনো পক্ষ এ রায়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত (prejudiced) হতে পারে। তবে যেহেতু এ রায়টি কোনোভাবেই বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেলকে সাহায্য করে না, বরং তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায়, সেহেতু এই রায় নিয়ে আর বিস্তারিত আলাপ করার প্রয়োজন নেই।

<u>ঋণাত্মক দায় ও নরহত্যাঃ</u>

৫.১২ আগেই বলেছি সুরতহাল প্রতিবেদনের উক্ত বক্তব্য যেহেতু সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা, সেহেতু আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, রাষ্ট্রপক্ষ তার কোনো সাক্ষ্য বা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে যে, ঘটনার প্রাসঙ্গিক সময় এই মামলার ভিকটিম সালমা আসামীর হেফাজতে ছিল এবং ঘটনার দিন রাতে বা ঘটনার সময় তারা একত্রে ছিল। যেহেতু আসামীর এই ন্যূনতম উপস্থিতি প্রমাণ করতে রাষ্ট্রপক্ষ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু এও বলতে দ্বিধা নেই যে, সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা অনুযায়ী এবং আমাদের উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত ও বিভিন্ন সময়ে প্রণীত ঋণাত্মক দায়মূলক নির্দেশনা এই মামলার আসামীর উপর কোনোভাবেই বর্তাবে না। সেহেতু এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ঘটনায় একটি নরহত্যা হয়েছে এবং আত্মহত্যা হয়নি বা অন্য কোনোভাবে মামলার ভিকটিম নিহত হয়নি। এটি প্রমাণ করতে গিয়ে প্রসিকিউশন পক্ষ সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২), ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-৭) এবং ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন যিনি করেছেন সেই ডাক্তার (পি.ডাব্লিউ-১১) কে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা যাক যাতে সাধারণত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং যা প্রদর্শনী-৭ হিসাবে এই মামলায় উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, পি.ডাব্লিউ-১১ নিম্নলিখিত জখমগুলি পেয়েছেনঃ

1. *Burn whole Body including hair (scalp) except sole of foot (both).*
2. *Congestion on Right side of Scalp.*

এবং মৃত্যুর কারন হিসাবে তার নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেন,

“In my opinion death was due to Hypovolumic shock resulting from extensive burn which was antemortem in nature.”

৫.১৩ এ থেকে দেখা যায়, তিনি এই বক্তব্যের সমর্থনে পি.ডাব্লিউ-**১১** হিসাবে ট্রাইব্যুনালে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তাতে তার প্রতিবেদনের হুবহু বক্তব্য তিনি সমর্থন করেছেন এবং আসামীপক্ষের জেরায় তিনি বলেছেন যে, হত্যাজনিত কারনে যদি কোনো ভিকটিম নিহত হয় তাহলে “Homicidal in nature” উল্লেখ করা থাকে। স্বীকৃত যে, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-৭) নরহত্যাজনিত (Homicidal in nature) কথাটি উল্লেখ করা নেই। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, যেখানে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে নরহত্যাজনিত (Homicidal in nature) লেখা থাকেনা সেখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে আদালতকেই নির্ধারণ করতে হবে এটি নরহত্যাজনিত মৃত্যু কিনা। আমরা তার সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত এবং আমরাও পারিপর্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা এবং সাক্ষ্য বিবেচনায় নেয়ার জন্য এই মামলার সাক্ষীসমূহের সাক্ষ্য এবং দালিলিক সাক্ষ্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছি, যেখানে কোথাও আমরা পাইনি যে, এই মৃত্যুকে কোনোভাবেই নরহত্যা বলা যাবে। বরঞ্চ সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) এবং ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-৭) পরীক্ষা করলে যে কোনো সুস্থ্য বোধজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে দুই বা তিন ধরনের মতামত দেয়া সম্ভব। যেমন- ভিকটিম গায়ে কেরোসিন দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে বা দুর্ঘটনাবশতঃ কেরোসিন বা অন্য কোথাও থেকে আগুন লেগে ভিকটিম নিহত হয়েছে অথবা ভিকটিমকে কেউ একজন হত্যা করে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে এটিকে আত্মহত্যা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এরকম তিন ধরনের সম্ভাবনা যেখানে উন্মুক্ত সেখানে

আদালতের পক্ষে কোনোভাবেই বলা সম্ভব না যে, এটি একটি নরহত্যাজনিত ঘটনা। সুতরাং, আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, রাষ্ট্রপক্ষ ভিকটিম সালমার এই মৃত্যুকে একটি নরহত্যা হিসাবে প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

৫.১৪ এছাড়াও প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, কেউ কেউ বলেছেন ঘটনার পর পর তারা ভিকটিমের বসত ঘরে ঢুকেছেন, কেউ কেউ আবার বলেছেন ঘরের দরজা বন্ধ পেয়েছেন এবং দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছেন, একজন বলেছেন ভিতর থেকে ছিটকানি আটকানো ছিল এবং দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছেন। সর্বপরি তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজেই বলেছেন যে, তিনি সাক্ষীদের সহায়তায় ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকেছেন। এ রকম একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় প্রসিকিউশন পক্ষের দায়িত্ব ছিল বিচারিক আদালতে উপযুক্ত সাক্ষ্য বা সাক্ষী উপস্থাপন করা যা থেকে পরিষ্কার বলা যায় যে, ভিকটিম আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরপর ভিকটিমের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল নাকি খোলা ছিল অথবা দরজা কি ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে আটকানো ছিল, নাকি কেউ দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকেছিল। এ ধরনের উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলাটি প্রমাণ করতে শুরু থেকেই ব্যর্থ হয়েছেন।

৬. উপসংহারঃ

উপরোক্ত মৌখিক, দালিলিক সাক্ষ্য, পারিপার্শ্বিক ও প্রাসঙ্গিক আইন বিবেচনায় আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি যে, রাষ্ট্রপক্ষ এই মামলা যুক্তিসংগত সন্দেহ বহির্ভূতভাবে (beyond reasonable doubt) প্রমান করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। রাষ্ট্রপক্ষ এও প্রমাণ

করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, এই মামলায় আসামীর উপর ঋণাত্মক দায় নীতিটি প্রযোজ্য হবে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে এ আদালতের অভিমত এই যে, এই মৃত্যুদন্ড রেফারেন্স মামলাটি গ্রহণ করা কোনোভাবেই যুক্তিসংগত হবে না বিধায় এটি নাকচ করা উচিত। পাশাপাশি যেহেতু আপীলকারী পক্ষ দেখাতে সমর্থ হয়েছে যে, আসামীর বিরুদ্ধে তর্কিত রায়ে ট্রাইব্যুনাল আসামীকে বেআইনীভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন সেহেতু উক্ত আপীল মঞ্জুরপূর্বক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত রায় বেআইনী ঘোষণা করা উচিত বলে আমরা মনে করি। সুতরাং আসামী খালাস পাওয়ার অধিকারী।

৭. আদালতের আদেশঃ

উপরোক্ত ঘটনা ও আইনী পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে অত্র আদালতের আদেশ নিম্নরুপঃ

১) এই মৃত্যুদন্ড রেফারেন্সটি নাকচ করা হলো (rejected)।

২) আসামী আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু কর্তৃক দাখিল কৃত ফৌজদারী আপীল নং ৫৬৫৬/২০১৭ মঞ্জুর করা হলো এবং সাথে সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, যশোর কর্তৃক নারী ও শিশু মামলা নং ৬০/২০১৩ এ ১৭.০৫.২০১৭ ইং তারিখে প্রদত্ত তর্কিত আদেশ ও রায়টি বাতিল করা হলো (set aside)। সেইমর্মে আসামীর দাখিলকৃত জেল আপীল নং ২১০/২০১৭ টি নিষ্পত্তি করা হলো (disposed of)। সুতরাং আপীলকারী আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু কে খালাস প্রদান করা হলো।

৩) জেল কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল যে, অন্য কোন মামলায় সংশ্লিষ্ট না থাকলে এই আপীলকারী **আব্দুল্লাহ ওরফে তিতুমীর ওরফে তিতু, পিতা মোঃ আইয়ুব আলী, সাং সুলতানপুর (দক্ষিণ পাড়া) (বাবুপাড়া), থানা-কোতয়ালী, জেলা-যশোর** কে তাৎক্ষণিকভাবে জেল থেকে মুক্ত করে দেয়া হোক।

আদালতের উপরোক্ত আদেশ সম্বলিত একটি অগ্রিম আদেশ প্রেরন করা হোক।

নিম্ন আদালতের নথি পাঠিয়ে দেয়া হোক ।

শেখ হাসান আরিফ (বিচারপতি)

আমি একমত।

বিশ্বজিৎ দেবনাথ (বিচারপতি)